Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-I, October 2025, Page No. 32- 38
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.01W.039

লোকজ ঐতিহ্য ও বাস্তব জীবন: বুদ্ধদেব গুহর নির্বাচিত ছোটগল্পের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ

সরলা মাণ্ডি, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজী মহাবিদ্যালয়, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 17.10.2025; Accepted: 29.10.2025; Available online: 31.10.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Buddhadeb Guha occupies a unique place in Bengali narrative literature. In his short stories, as in his novels, Buddhadeb Guha imprints his identity as a socially conscious and rebellious artist, depicting the divide and deception between the rich and poor, their fragile vanity, moral decay, and generational conflict. A large part of his short stories filled with the presence of forests, hills, tribal men and women, their traditional beliefs, customs, deities, flowers, creepers and forest animals. He has kept these neglected and unacknowledged people alive through his creation. In Buddhadeb Guha's short stories, we find vivid portrayals of their lives and ways of living. Most of his short stories are enriched with various elements of folk culture – folk beliefs, folk rituals, folk deities, folk instruments, folk songs and traditional beverages – all of which reflect the vibrant pulse of the common people. Buddhadeb Guha, as a socially aware artist, leaves a mark of protest in his fiction. a keen observer of life, his realized how innumerable events occur in human existence and are eventually engulfed by time, while only the essence of joy and sorrow remains – eternal and universal. As an artist of these emotions, Guha bears witness to his age and society, expressing the eternal human experience with rare honesty. In this lies the essence of his artistic achievement.

Keywords: Middle Class People and Tribal Community, Folklore Components, Life Style, Tribal Food and Drinking, Songs and Music, Folk Deities

বাংলা কথাসাহিত্যে বুদ্ধদেব গুহ বিচিত্রমুখী প্রতিভার প্রতিফলনে সমৃদ্ধ। লেখক হিসেবে তিনি অন্যান্য কথাসাহিত্যিক থেকে ভিন্ন ধরণের, তাঁর লেখার বিষয়ভঙ্গি ও বৈচিত্রে এক স্বতন্ত্র বিরাজমান। তিনি অনেক উপন্যাস রচনা করেছেন এবং এই উপন্যাস রচনার পাশাপাশি অনেক ছোটগল্পও রচনা করেছেন। তাঁর রচিত উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে তিনি গ্রামীণ সাধারণ মানুষের কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর বেশিরভাগ ছোটগল্পের মধ্যে তিনি আদিবাসী মানুষের চিত্র এবং তাদের প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার, দেবদেবী, হাট-বাজার, অরণ্য, পাহাড়, গাছপালা, ফুল-ফল, লতাপাতা ও অরণ্যের প্রাণী তাঁর রচনার অনেকখানি জুড়ে বিরাজ করেছে। এইসব অবহেলিত মানুষদের তিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। তিনি তাঁর ছোটগল্পে তাদের জীবনযাত্রা ও জীবনচিত্রকে তুলে ধরেছেন এবং লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকগান, লোকখাদ্য, লোকভাষা প্রভৃতি নানান লোকউপাদানের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় তাঁর ছোটগল্পে। এখানে আমি তাঁর বেশ কয়েকটি ছোটগল্প নির্বাচন করেছি আলোচনার জন্য। যেমন- 'বিড়াল', 'ইছামতী', 'জোয়ার', 'মুখচুরি', 'তিস্তা', 'সংশয়', 'শিঙাল', 'প্রবেশ', 'লিখন', 'পরী পয়রা' ও 'গোসাঘর প্রাইভেট লিমিটেড'। এই ছোটগল্প গুলোতে লোকজ উপাদানের নানান প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে। লোকজ উপাদানগুলি হল লোকগান, লোকভাষা, লোকখাদ্য, লোকপানীয়, লোকবাদ্য, লোকজীবন-জীবিকা, লোকদেবতা, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার প্রভৃতি

বর্নিত হয়েছে এই ছোটগল্পগুলোতে। এই গল্পগুলি থেকে আমরা জানতে পারি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-জীবিকা, তাদের সংস্কৃতি, খাবারের ধরণ, পানীয়, তাদের আচার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়। আবার তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে প্রকৃতির কোলে লালিতপালিত মানুষের জীবনের নানান ওঠা পড়ার বিষয়। বুদ্ধদেব গুহ গল্পের বিষয়বস্তুকে সমৃদ্ধ করেছে গল্পের মধ্যে লোকঐতিহ্যকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। তিনি গল্পের মধ্যে স্থানীয় ভাষা, শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার ফলে গল্পের বিষয়বস্তুকে আরও জীবন্ত করে তুলেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত দেবদেবী, পূজা-পার্বণ ও বিভিন্ন উৎসবকে তিনি তুলে ধরেছেন এই গল্পগুলিতে। তিনি ছোটগল্পে লোকউপাদানকে শুধু প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করেননি বরং গল্পের বিষয়বস্তুর সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত তা তিনি দেখিয়েছেন। এই লোকউপাদানের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের জীবন, সংস্কৃতি এবং সমাজের প্রতি গভীর উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন গল্পের মধ্যে। আদিবাসী মানুষেরা শিকার ও পেশার কাজের জন্য তারা ভারতের নানা জায়গায় ঘুরেছে বলে পটভুমির বিশেষ বৈচিত্র তৈরী হয়েছে গল্পগুলিতে।

বুদ্ধদেব গুহর লেখা এক অন্যতম গল্প হল 'বিড়াল'। এই গল্পের মধ্যে তিনি লোকজ উপাদানের নানান প্রসঙ্গের কথা তুলে ধরেছেন। যেমন- লোকখাদ্য, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার ও লোকভাষা প্রভৃতি। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র খেয়ালবাবু। তার আদি বাড়ি বরেন্দ্রভুমির পাবনা জেলায়। কিন্তু দেশভাগের পর দেখা যায় খেয়ালবাবু শ্যামবাজার ও মধ্যমগ্রামের মোড় থেকে যে রাস্তাটি বাঁদিকে চলে গেছে সেই রাস্তার কাছে একটি বাড়িতে থাকেন। গল্পে দেখা যায় খেয়ালবাবু অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসে খেতে বসেন এবং খেয়ালবাবুর স্ত্রী মনোরমা খেয়েলবাবুকে কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পেতে খেতে দেন। সেই পিঁড়িতে বসে খেয়ালবাবু মসুরির ডালে কাঁচা লঙ্কা ডলে লাল লাল ভাত মেখে খান, তার সঙ্গে ছিল কুমড়ো ও বেগুনের ঘ্যাঁট এবং পাটপাতা দিয়ে কাঁঠালের বিচির লোত্-লোত্ তরকারি। এই খাদ্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে একজন সাধারণ অভ্যাসে অভ্যস্ত খেয়ালবাবুর অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থের অভাবে সে যে দীর্ঘদিন মাছ খেতে পারেনি, সেই ইলিশ মাছ যখন তার মেয়ের প্রেমিক ঝুন্টু নিয়ে আসে তখন সেই কাঁচা ইলিশ মাছের মিষ্টি গন্ধে খেয়াল বাবুর গলায় ভাত আটকে যায়। খেয়ালবাবু ইলিশ মাছের গন্ধ পাওয়ার পর সে মনে মনে ভাবতে থাকে ইলিশেরয লোভনীয় নানান পদের কথা। তিনি কখনো কখনো ভাবেন কাঁচা লঙ্কা কালোজিরে দিয়ে ইলিশের ঝোল, সর্ষে বাটা দিয়ে ইলিশ, দই ইলিশ, ইলিশের মাথা দিয়ে কচু শাক রান্নার কথা। সংসারের সবার কথা ভাবতে গিয়ে নিজের পছন্দের খাবার, শখ সবকিছুই ভুলে যেতে হয় খেয়েলবাবুর মতো হাজার হাজার মধ্যবিত্ত মানুষদের। বুদ্ধদেব গুহ লোকখাদ্যের বর্ণনার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের চিত্রকেই বাস্তবায়িত করেছেন 'বিড়াল' গল্পের মধ্যে।

এই 'বিড়াল' গল্পের মধ্যেই আমরা লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাসের কথাও পাই। সাধারণ গ্রামীণ মানুষ বিশ্বাস করে আসছে কালো বিড়াল অলুক্ষণে এবং এই কালো বিড়ালের ডাকও বিপদের সংকেত দেয়। বুদ্ধদেব গুহর 'বিড়াল' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র খেয়ালবাবু বাড়ির বাইরে দেখতে পান একটি কালো বিড়াল ক্রমাগত ডেকে চলেছে। তিনিও বিশ্বাস করেন এই কালো বিড়াল অলুক্ষণে। গল্পে দেখা যায় ব্যরাকপুর ইছামতীর ধারে খেয়ালবাবুর এক আত্মীয়ের বাড়ির উঠোনে কে যেন একটা কালো বিড়ালের হাড় পুঁতে রেখে দিয়েছিল ফলে সেই বাড়ির লোক নিরবংশ হয়ে গিয়েছিল সেটাও খেয়ালবাবু দেখেছে। সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে কোন বিপদ ঘটার আগে কালো বিড়াল ডাক দেয়। তাই বিড়ালের ডাক শোনা মাত্রই লাঠি নিয়ে তাড়া করে। কারণ লাঠি নিয়ে তাড়া করলে বিপদ ঘটার আশঙ্কা কমে যায়। এগুলো সবই লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাসের অন্তরভুক্ত।

খেয়ালবাবু দেশভাগের পর থেকে তিনি আদি বাড়ির বাইরে আছেন। দীর্ঘদিন বাইরে থাকার কারণে তিনি বাঙালত্ব প্রায় বিসর্জন দিলেও পাবনা জেলাতে চন্দ্রবিন্দুর যে টান সেটা তিনি বিসর্জন দিতে পারেননি। এই চন্দ্রবিন্দুর জন্যই খেয়ালবাবুকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। যেমন এই চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণের জন্যই বেয়ারা হিতেনবাবু মজা করেন মাঝে মধ্যে খেয়ালবাবুকে। খেয়ালবাবু হিতেনকে বলেন- "আর কোন কাজ বাঁকি আছে কী না।"[১] তিনি 'বাকি' কথাটিকে 'বাঁকি' উচ্চারণ করার জন্য সবার কাছে হাসির পাত্র হন। ফলে আমরা 'বিড়াল' গল্পে খেয়ালবাবুর এইরকম আঞ্চলিকগত ভাষা ও উচ্চারণের মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব গুহর গল্প পাঠ করে নতুন করে হারিয়ে যাওয়া লোকভাষার সাথে পরিচয় হই।

বুদ্ধদেব গুহর 'ইছামতী' গল্পে আমরা লোকখাদ্যের প্রসঙ্গ পাই। এই গল্পের এক অন্যতম চরিত্র সবুজ, তার ছোটবেলার সাথী তোর্ষা তাদের বাড়ি যায়। ছেলেবেলার নানা প্রসঙ্গের সঙ্গে কথা আলোচনার সাথে সাথে তাদের পছন্দের খাদ্য তালিকার কথাও পাওয়া যায়। সবুজ কোন কোন খাবার খেতে ভালোবাসত, তোর্ষা কোন কোন খাবার খেতে ভালোবাসত তার কথা বলছিল। তেমনেই একটি তোর্ষার উক্তি হল-

> "তাহলে বলি খাওয়ার কথা। তুমি পাটশাক আর কাঁঠালের বীচি দিয়ে লোত লোত তরকারী ভালবাসতে আর মৌরলা মাছ ভাজা। কাঁচালঙ্কা ধনেপাতা দিয়ে তেল-কই, বড় চিতলের তেলওয়ালা পেটি-। ভাপা ইলিশ। নারকেল সর্ষে দিয়ে বাগদা চিংড়ী। পাটালি গুড়। তিলের নাড়ু, নারকেলের তক্তি...।"[২]

তারপর সবুজ তোর্ষার পছন্দের খাবার বলে-

> "এক নম্বর: ভালবাসত চালতা-মাখা-কাঁচা লঙ্কা ধনেপাতা নুন-চিনি দিয়ে।।... দু'নম্বর: পাকা জলপাই, পোড়া শুকনো-লঙ্কার গুঁড়ো আর নুন দিয়ে মেখে। তারপর মায়ের তৈরী খেজুর পাটালির সর-থক্ থক্ পায়েস, শ্বেত পাথরের বাটিতে। চার নম্বর: মাসীমার হাতের ক্ষীরের পাটিসাপটা।"[৩]

এই গল্পের মধ্যে আমরা লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের পরিচয়ও পাই। গল্পে দেখা যায় তিস্তা ও তোর্ষা দুজনেই ছেলেবেলার গল্প ও প্রিয়জনের গল্প করছিল। সবুজ ছাদের আলসেতে বসে গল্প করছিল দেখে চাঁপা বলে ওঠে- "অন্ধকারে ছাদের আলসেতে বসতে নেই, আমি একুনি মোড়া নিয়ে আসছি।"[৪] এই উক্তির মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের কথা। ছাদের অন্ধকারে আলসেতে বসলে ভূতে ধরতে পারে এই বিশ্বাস থেকে চাঁপা সবুজকে বসতে বারণ করছে।

'তিস্তা' বুদ্ধদেব গুহর আর এক উল্লেখযোগ্য গল্প। গল্পে দেখা যায় সর্বগ্রাসী তিস্তা সবকিছুই ভেসে নিয়ে গেছে। রাক্ষসী তিস্তার তোড়ে ভেসে গেছে যোগেনের দাদা নগেনও। তারপর দেখা যায় বাস্তভিটার টানে যোগেন সেখানে চলে যায়। যোগেন গ্রামে ফিরে এসে হারু কাকার কাছে বন্যার তাণ্ডবের কথা শোনে। এই বন্যায় দেখা যায় গ্রামের ছেলে বুড়োরা জমি উদ্ধারের কাজে লেগে যায়। জমি উদ্ধারের কাজ থেকে ফিরে এসে দুপুরে তারা একসঙ্গে খেতে বসে। গল্পে তেমনেই একটি উক্তির মধ্যে তাদের খাদ্য প্রসঙ্গের কথা ধরা পড়ে, তারা কি কি খাবার খেত কাজ থেকে ফিরে আসার পর- "গাছতলায় সকলে বসে, কলাই করা থালায় ভাত আর বেগুন সিদ্ধ খেল, নুন আর কাঁচা পেঁইয়াজ দিয়ে, তাতেই কত তৃপ্তি।"[৫] খাদ্যের এই বর্ণনার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অভাব অনটনের চিত্র।

এই গল্পের মধ্যেও আমরা লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের প্রসঙ্গও পেয়ে থাকি। এই সর্বনাসী তিস্তাই যোগেনের দাদার ঘরবাড়ি সবকিছুই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। যোগেন গ্রামে ফিরে এসে হারু কাকার সঙ্গে দেখা করার জন্য গ্রামের মাঝে যে অশ্বত্থ গাছ ছিল তার দিকে এগিয়ে যায়। সেই সময় যোগেন দেখে-

> "ওর মাথার ওপর একটা চাতক পাখি ফটিক জল ফটিক জল ডাকতে ডাকতে চমকে বেড়াতে লাগল। যোগেন একবার উপরে তাকিয়ে জোরে দাঁতে দাঁত চেপে বলল তিস্তায় তো অনেক জল হলো ওইখানে যাওনা ক্যান?"[৬]

এই উক্তির মধ্যে বোঝা যায় যোগেন পাখির এই ডাকে রেগে গেছে। তার এই রেগে যাওয়ার পেছনে একটা কাহিনী আছে। সাধারণ মানুষেরা বিশ্বাস করে থাকে চাতক পাখি ডাকলে বৃষ্টি হয়। প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় তিস্তার জল বেড়ে যাওয়ায় গ্রাম, ঘরবাড়ি সব ভেসে নিয়ে গেছে। আবার যদি বৃষ্টি হয় তাহলে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যাবে এই ভয়ে যোগেন চাতক পাখির ডাকে রেগে যায়। এর থেকে বোঝা যায় যোগেন লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারে বিশ্বাস করে চলে। গল্পের মধ্যে আমরা ঘুঘু পাখির প্রসঙ্গও পাই। দেখা যায় একজোড়া ঘুঘু পাখি কোথা থেকে উড়ে এসে যোগেনের উঠোনে ঘুরে বেড়াছে। বুনি বলে এগুলো বাস্তু ঘুঘু। বাস্তু ঘুঘুকে কেন্দ্র করে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার বিরাজ করেছে সাধারণ মানুষের, বাড়িতে বাস্তু ঘুঘু বাসা বাঁধলে তা শুভ ও সৌভাগ্যের প্রতীক।

এই 'তিস্তা' গল্পেই দেখা যায় সর্বগ্রাসী তিস্তার কবলে পড়েও সেখানের সাধারণ মানুষ আশা ছাড়েনি, বরং বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। যোগেন গ্রামে ফিরে এসে দেখে গ্রামের ছেলে বুড়োবুড়ি সবাই নিজের নিজের জমি উদ্ধার করার কাজে ব্যস্ত হয়ে যায় সকাল থেকেই। তারা খুব চেঁচামেচি উদ্দীপনা সহযোগে কাজ করে থাকে। ছোটবেলা থেকে এযাবৎ কাল পর্যন্ত তিস্তার এইরকম ভয়াবহ রুপ দেখেনি যোগেন, এবছর যেমনটা দেখছে সে। এই প্রথম সে তিস্তার

এই ভয়াবহ রুপ খুব সামনে থেকে উপলব্ধি করছে। বলা যায় ছোটবেলায় এমন কোনদিন দেখেছে বলে মনে পড়ছে না যোগেনের। তিস্তার কাছাকাছি বসবাস করা মানুষ সকাল থেকে কাজ করার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তারা প্রত্যেকে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছে। যারা আগে ছিল মন্থরগতি অলস, ভাগ্যে বিশ্বাসী, অল্পতে সন্তুষ্ট মানুষ গুলোর মধ্যে এখন সে অন্যরূপ দেখছে। বাঁচার তাগিদ তাদের মধ্যে এতটা ছিল যা তাদের সকলের চোখ মুখ দেখে তা প্রকাশ পাচ্ছে। বীরু দাস কোদাল কাঁধে ছুটে যাচ্ছিল সেই সময় যোগেন তার কাকার খবর জিজ্ঞাসা করে, তখন বীরু দাসের অপরাজেয় কণ্ঠস্বর শোনা যায়-

> "আর ক্যান? এবার লাইগ্যা পড়। হালার ব্যাটা হালার তিস্তা আমাগো হারাবে, তা অইব না।"[৭]

যোগেন জিজ্ঞাস করে যে সরকার কিছু করবে কিনা, তার উত্তরে হারু বলে-

> "কইরলে করবে। তাগো লাইগ্যা বইস্যা থাহনের কাম কী? আমাগো কি হাতরথ নাই? না, তাও নদীতে নিছে?"[৮]

সবাই কোদাল নিয়ে কাজে যায় কিন্তু যোগেন যায় না। যোগেন বুনির পাশে গিয়ে বসে, তখন বুনি বলে-

> "সবাই কোদাল হাতে লাইম্যা গেছে আর আপনি কেমন মরদ? খালি খালি নিঃশ্বাস ছাড়েন।"[৯]

বুদ্ধদেব গুহর 'জোয়ার' গল্পটি সুন্দরবন অঞ্চলের পটভূমিকে কেন্দ্র করে রচনা করেছেন। এই গল্পের মধ্যে লোকগান ও লোকভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অয়ন বোস। তার একটি বোট আছে, আর সেই বোটের সারেং স্যামুয়েল, এঞ্জিনম্যান নটবর, খালাসী ঘেটো। সেই বোটের এঞ্জিনম্যান নটবরের গরমে ঘুম হচ্ছে না বলে স্যামুয়েলের কাছ থেকে একটা চারমিনার সিগারেট নিয়ে আগুন ধরিয়ে ভাটিয়ালী গান করে। গানটি নিম্নে উল্লেখ করা হল-

> "ও সুন্দর জরিনা রে, তোমার না দেখলে মোর অঙ্গ যায় জ্বলে।"[১০]

এই গানের মধ্যে লোকগানের ভাটিয়ালী প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। আর এই জোয়ার গল্পের মধ্যেই আমরা লোকভাষার পরিচয়ও পেয়ে থাকি। অয়ন বোসের বোটের সারেং, এঞ্জিনম্যান ও খালাসীর মধ্যে আলাপ আলোচনা হচ্ছে, তাদের এই কথার মধ্যে লোকভাষা অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গের ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। স্যামুয়েল নটবরকে বোতল বার করতে বললে নটবর বলে-

> "ওসব ঝামেলি করো না স্যামুয়েলদা, সাহেবের মেজাজ গতিক ভালো লয় এট্টুখানি চুপ মেইরে বসো দিকিনি।"[১১]

গরমের জন্য নটবর জালি বোটে শুতে গেলে স্যামুয়েল তা বারণ করে। কিন্তু নটবর তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটার কারণ হিসেবে বলে-

> "শালা ঘেটো এমন ঘসর ঘসর করি দাদ চুলকোয় যে ওর পাশে ঘুমোয় কার সাদ্দি, পরানটা ভালো লাগতিচে না গো, একটা সিগারেট খাওয়াও দিকিনি।"[১২]

জালি বোটটা বড়ো বোটের পিছনে বাঁধা ছিল। নটবর জালি বোটে শুতে যায়। হঠাৎ ঝপ্ করে জলে পড়ার শব্দ শোনা যায় আর তখনই খালাসী ঘেটোর বুক ফাটা আর্তনাদ শোনা যায়-

"সাহেব- স্যামুয়েলদা নটবরকে জানোয়ারে নে গেলগে।"[১৩]

এই উক্তির মধ্যে লোকভাষা 'গেলগে' শব্দটি পাওয়া যায়।

'জোয়ার' গল্পটি সুন্দরবন অঞ্চলের পটভূমিকায় রচিত হওয়ায় এই অঞ্চলেই গ্রামীণ লোক দেব-দেবী বনবিবি ও দক্ষিণরায়ের কথাও পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস আছে তাদের যেকোন বিপদ আপদে পড়লে বনবিবিই তাদের রক্ষা করেন। তাই গল্পকার এই প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "পৃথিবীতে এমন কোন শিকারী জন্মায়নি যে অমাবস্যার শেষ রাতে সবে ভাঁটি দেওয়া সুন্দরবনে কাদার মধ্যে সবে মানুষ নেওয়া বাঘকে অনুসরণ করে হ্যাঁতাল গড়ানের বনে ঢুকতে পারে। সে যদি বাঁচে তবে বনবিবি বাঁচাবেন।"[১৪]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে দক্ষিণরায় সুন্দরবন অঞ্চলের লোকদেবতা। দক্ষিণরায়কে সুন্দরবন অঞ্চলের বাঘের রাজা বলা হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসীরা দক্ষিণরায়কে সুন্দরবনের ভাঁটি অঞ্চলের অধিপতি বলে মনে করেন।

এই অঞ্চলের মানুষেরা কাঠ, মধু সংগ্রহ করার আগে দক্ষিণরায়ের পূজো দেন। এই 'জোয়ার' গল্পের গল্পকার দক্ষিণরায় সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন-

> "বাবা দক্ষিণরায়ের উপর নটবরের বড়ো ভক্তি ছিল নটবরটার। ইঞ্জিনঘরের কুলঙ্গীতে বনবিবিরও মুর্তি রেখেছিল আদিমুদ্দি। সুন্দরবনে এলেই ওরা পূজো করতো।"[১৫]

'মুখচুরি' গল্পে সাধারণ মানুষের লোকজ জীবন যাপনের চিত্র পাওয়া যায়। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র জীবনবাবু, সে ছোটবেলা থেকেই কটক শহরে থাকত। পরে সেই ফেলে আসা কটক শহরকে চিনতে পারছে না। আগের কটক শহরের অবস্থা ও বর্তমান কটক শহরের মধ্যে আকাশ পাতাল পরিবর্তন হয়েছে। আগের কটক শহরের মানুষজন, যানবাহন, মানুষজনের চিৎকার চেঁচামেচি সেই শান্ত কটক শহর হারিয়ে গেছে। সারা দেশের জঙ্গল কী করে যে গত ছত্রিশ বছরে প্রাই নিশ্চিহ্নই হয়ে গেল তা ভাবলে জীবনবাবুর অবাক লাগে। এখন শহরের হাওয়াতে কোন হিম নেই, ভোরের গায়ে কোন গন্ধ নেই, নদীর জলের মাছের আঁশ নেই, পাখির পালকে কোন গন্ধ ভাসে না। আগে বাখরা বাদের যে গলিতে তাদের বাড়ি ছিল তার গলির মোড়েই একটি পানের দোকান ছিল লক্ষ্মণ নায়কের, দোকানের দেওয়ালেই মস্ত একটা আয়না ছিল। জীবনবাবুর গাড়ির ড্রাইভার সতীকান্ত গোচারি রোজেই সেই আয়নার সামনে চুল আঁচড়াতো, টেরি বাগাতো গাড়ি দাঁড় করিয়ে। সতীকান্ত লক্ষ্মণ নায়কের দোকান থেকে পান নিত। পান খাওয়ার পর সতীকান্ত গাড়ি টপ গিয়ারে ফেলে গান গাইত-

> "মেরে লাল দোপাট্টা মল্‌মল্/ কহো জীই-ই, কহো জীই-ই,/ কহো জীই-ই।"[১৬]

গানের শব্দের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে লোকগানের প্রসঙ্গ। এই গল্পের মধ্যেই আমরা লোকভাষার চিত্রও পাই। দেখা যায় সাইকেলের দোকানে ছানাদাকে দেখে জীবনবাবু দাদা বলে সম্বোধন করাতে ছানাদা রেগে গিয়ে বলে-

> "কে মশাই আপনি? বয়সে কি আপনি আমার থেকে ছোট নাকি? দামড়া পুরুষে, চাকরিতে ঢোকার সময় ছাড়া অন্য সময়েও বয়স কমায় এ কথা তো শুনিনি কখনও।"[১৭]

এই 'দামড়া' কথাতেই জীবনবাবু ছানাদাকে চিনে ফেলেন। 'মুখচুরি' গল্পে বুদ্ধদেব গুহ হারিয়ে যাওয়া গ্রাম্য ভাষাকে খুব সুন্দর ভাবে ব্যবহার করেছেন।

বুদ্ধদেব গুহর 'সংশয়' গল্পেও লোকভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। পুরী থেকে বাসে করে ধবলগিরি, কোনারক, দুধকুণ্ড, ভুবনেশ্বর, লিঙ্গরাজ মন্দির, নন্দনকানন, উদয়গিরি ও খন্ডগিরি পরিক্রমা করে যাত্রীদের নিয়ে পুরীতে ফিরে আসবে বাস। আর সেই বাসের একজন যাত্রী হলেন পূর্ববঙ্গের এক ব্যবসায়ী। তিনি ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তার কথার মধ্যে আমরা পূর্ববঙ্গের লোকভাষার টান লক্ষ করি। ব্যবসায়ী কোনারক মন্দিরে পৌঁছে শালীকে বলে-

> "এইবার চুপচাপ ছায়ায় বইস্যা ভাল কইরা আমার লাইগ্যা দু' খিলি পান সাজা দেখি। জর্দা ভইরা দিস। যাতি গা গরম হয়।"[১৮]

তারপর ব্যবসায়ী শালী ভুতি ঘাসের ওপর বসে ফিসফিস করে বলে-

> "ক্যান? গাও গরমের এহনও বাকি আছে নাকি এই সব দ্যাইখা টেওখ্যাও? কী খিট্ ক্যাল্! কী খিট্ ক্যাল্! ছাওয়াল, ছাওয়াল-বৌ সঙ্গে লইয়্যা কেউ এমন জাগায় আসে?"[১৯]

কোনারক মন্দিরের ভাস্কর্য দেখে ব্যবসায়ীর শালী এই ধরনের মন্তব্য করেন।

'প্রবেশ' গল্পের মধ্যেও লোকভাষার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। এই গল্পের অন্যতম চরিত্র হল যোগেশ । যোগেশের বাড়ি পূর্ববঙ্গে, সে একজন চিফ ইঞ্জিনিয়ার। যোগেশ ঘোষ বাঙালদের মধ্যে একজন যিনি আজও বাঙালি বলে গর্ববোধ করেন। তিনি পূর্ববাংলার ভাষায় কথাও বলেন। তারই একটি উক্তি নিম্নে উল্লেখ করা হল-

> "যাই কও আর তাই কও আইসেন বইস্যেন কইলে যতডা ভালবাসা ভালবাসা গন্ধ পাওন্ যায় তোমাগো আসুন বসুনে তার ছিঁটেফোঁটাও নাই।"[২০]

আগে যোগেশ বহু বছর ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। খুব সুন্দরভাবে ইংরেজি ভাষাও বলতেন। সাহেবদের মতো ইংরেজি বলতে পারলেও মাতৃভাষা বাংলা ইচ্ছে করেই বলতেন। যদি কেউ বুঝতে না পারে তখন তিনি বলেন-

> "হেইডাই ত ভাষা আমার। বাঙাল হইয়া করলুম খেলুম মরলুম জ্বললুম কইরা জাত খোওয়াইতে পারুম না।"[২১]

গল্পকার খুব সুন্দরভাবে লোকভাষার প্রতি মানুষের যে সহজাত টান থাকা যে স্বাভাবিক তা যোগেশের কথার মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠে।

বুদ্ধদেব গুহর আর এক অন্যতম গল্প হল 'গোসাঘর প্রাইভেট লিমিটেড'। এই গল্পের মধ্যে প্রবাদ ও লোকভাষার প্রসঙ্গ পাই। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ব্যানার্জী ও মুখার্জী। ব্যনার্জী সাহেবের স্ত্রীর বয়ফ্রেন্ড যে আছে তার কথা জানার পর মুখার্জী বলেন 'করাক পিং' করে দেওয়ার কথা। এর অর্থ হল গুলি করা। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, 'জোর যার মুলুক তার', 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' প্রভৃতি প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে এই গল্পে। কিটু কথককে বাড়ি যাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে কথক তার উত্তরে বলে বাড়ি ছাড়া কোথায় যাবো, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। তারপর দরজা খুলে দেখে কথক গাড়িতে উঠতে বললে মিনিবাসের কন্ডাক্টার কুটুক্তি করেন। তখন কিটু বলে আজকাল 'জোর যার মুলুক তার' অর্থাৎ যার ক্ষমতা বা জোর বেশি এলাকা তার অধীনে থাকে। 'উইমেন্স লিব' বলে পুরুষরাই সবচেয়ে বেশি কথা বলে। তাই হাবুল ঘোষ বলেন 'চাচা আগে আপন প্রাণ বাঁচা'। কারণ মেয়েদের আত্মহত্যার কেস অনেক বড় করে ছাপা হয়, কিন্তু নারীদের খুন হয়ে যাওয়া পুরুষদের খবর কেউ রাখে না। গল্পটি লোকশব্দ ও প্রবাদ ব্যবহারের ফলে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

'লিখন' গল্পটির মধ্যে 'উঠল বাই তো কটক যায়' এই প্রবাদটি পাওয়া যায়। এর অর্থ হল হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া। হঠাৎ করে বোস সাহেব সারান্ডার জঙ্গলে মূনলাইট পিকনিকের ব্যবস্থা করে। মনীষা তাই বোস সাহেবের হঠাৎ সিদ্ধান্ততে বিরক্ত প্রকাশ করেছে। তখনেই এই প্রবাদটি বলেছে।

বুদ্ধদেব গুহর 'পরী পয়রা' গল্পের মধ্যে পাওয়া যায় লোকপানীয়র প্রসঙ্গ। গল্পটিতে আছে বাংলা ও ওড়িষ্যার সীমান্তবর্তী মুঠিয়া গ্রামের কথা। এই মুঠিয়া গ্রামেই থাকে পরীর বর মদন পয়রা। পয়রাদের কাজ স্যাকরাদেরই মতো। পরীর বর মদন বাড়িতেই বসে গয়না বানিয়ে বালেশ্বরে বড়ো মহাজনের দোকানে অর্ডার সাপ্লাই করে। আবার কোনকোন দিন দেখা যায় বারিংপোসি আর ঝাড়ফুকুরিয়ার মধ্যে সপ্তাহে যে হাট বসে একদিন সেখানে গিয়ে গয়না বিক্রি করে। গয়না বিক্রি করার পর শেষবেলা জঙ্গলের পথধরে এসে সুবর্ণরেখা পেরিয়ে মুঠিয়া গ্রামে ফেরে মদন। গ্রামের সঙ্গীদের সাথে হাঁড়িয়া খেয়ে গল্প করতে করতে দীর্ঘপথ পেরিয়ে আসে মদন। হাঁড়িয়া খাওয়ার পর সারাদিনের ক্লান্তি নিমেষেই দূর হয়ে যায়। সাধারণ গ্রামগঞ্জের মানুষেরা নিজেদের ক্লান্তি, দুঃখ, কষ্ট দুর করার জন্য বিভিন্নরকম নেশা করে থাকে। বুদ্ধদেব গুহ এই গল্পে সেই চিত্রটিই ফুটিয়ে তুলেছেন।

'শিঙাল' গল্পের মধ্যেও আমরা লোকপানীয়, লোকবাদ্য ও লোকজীবিকার প্রসঙ্গ পাই। কোয়েল নদীর তীরে ঘন জঙ্গল থেকে মেয়েরা এবং বাচ্চারা ঝুড়ি নিয়ে মহুয়া কুড়িয়ে নিয়ে যায়। গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা মহুয়ার রস লোকপানীয় হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। মহুয়ার রস খেয়ে ধমসা মাদল সহযোগে নাচ-গান করে। ধমসা মাদলের আওয়াজ পাহাড় ছাপিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করে। রাতের অন্ধকারে এদিক ওদিক এলোপাথাড়ি গুলি চালায়, যারফলে সম্বরের গুলি লেগে যায়। এই গুলিবিদ্ধ সম্বরের শরীরের সুস্বাদু অংশগুলো কেটে কেটে নিয়ে যায়, তারপর নৃত্য-গীত সহযোগে একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে আনন্দ উল্লাসে খেয়ে নেয় সবাই মিলে। 'শিঙাল' গল্পে বুদ্ধদেব গুহ আদিবাসী সমাজের এই ছোট ছোট উপাদান ও আনন্দ উৎসবকে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।

সাধারণ গ্রামীণ মানুষের জীবন-যাপন, দৈনন্দিন পথচলা, খাদ্যাভ্যাস ও তাদের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা সংস্কৃতি এবং তাদের লোকায়ত বৈভব তুলে ধরেছেন। শহরাঞ্চলের বাইরে থাকা গ্রামীণ অবহেলিত মানুষ ও সেইসব মানুষের নানা লোকউপাদানকে খুঁজেছেন ও আবিষ্কার করেছেন বুদ্ধদেব গুহ। বাংলা কথাসাহিত্যে বুদ্ধদেব গুহ এক অন্যমাত্রার সুর নিয়ে এলেন। যে সুরের মধ্যে উঠে এসেছে শহর থেকে অনেক দূরে জঙ্গলের ভিতরে থাকা মানুষের বাঁধাহীন জীবন। বুদ্ধদেব গুহ গল্পের মধ্যে তুলে ধরেছেন অরণ্যের কোলে বসবাস করা মানুষের জীবনযাত্রাকে এবং তাদের নানান লোকজ উপাদানকে। এমনকি আধুনিক জীবনে অভ্যস্ত মানুষের কথাও তিনি তুলেধরেছেন। তাই দেখা যায় আধুনিক মানুষের কণ্ঠে আমরা লোকজ উপাদানের সুরও পাই। তিনি তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে বিভিন্ন লোকজ উপাদান যেমন- লোকদেবদেবী, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকখাদ্য, লোকপানীয়, লোকভাষা, লোকবাদ্য প্রভৃতি তুলে ধরেছেন এবং তাঁর গল্পগুলো এক ভিন্নমাত্রা দান করেছেন। বুদ্ধদেব গুহ ছোটগল্পের মধ্যে লোকজ উপাদানগুলি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে লোকজ উপাদানের স্বরূপ সন্ধানী হিসেবে এক স্বতন্ত্র কথাসাহিত্যিক হয়ে উঠেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. গুহ, বুদ্ধদেব। শ্রেষ্ঠ গল্প। দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৩০৯।
২. গুহ, বুদ্ধদেব। প্রেমের গল্প। দে'জ পাবলিশিং, মে ২০২৩, কলকাতা, পৃ. ৩৬।
৩. তদেব, পৃ. ৩৭।
৪. তদেব, পৃ. ৩৭।
৫. গুহ, বুদ্ধদেব। ছোটগল্প (২য় খণ্ড)। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, আগস্ট ২০২২, কলকাতা, পৃ. ২৪৩।
৬. তদেব, পৃ. ২৪২।
৭. তদেব, পৃ. ২৪৩।
৮. তদেব, পৃ. ২৪৩।
৯. তদেব, পৃ. ২৪৪।
১০. গুহ, বুদ্ধদেব। প্রেমের গল্প। দে'জ পাবলিশিং, মে ২০২৩, কলকাতা, পৃ. ১৯২।
১১. তদেব, পৃ. ১৯০।
১২. তদেব, পৃ. ১৯২।
১৩. তদেব, পৃ. ১৯৩।
১৪. তদেব, পৃ. ১৯৪।
১৫. তদেব, পৃ. ২৪৪।
১৬. গুহ, বুদ্ধদেব। ছোটগল্প (১ম খণ্ড)। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, আগস্ট ২০২২, কলকাতা, পৃ. ২২৯।
১৭. তদেব, পৃ. ২৩২।
১৮. তদেব, পৃ. ২৪১।
১৯. তদেব, পৃ. ২৪১।
২০. তদেব, পৃ. ০৯।
২১. তদেব, পৃ. ১০।